নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা

দেবাশিষ সরকার

১১ মার্চ ২০১১ শুক্রবার। স্থানীয় জাপান সময় দুপুর ২টা ৪৬ মিনিটে টোকিওর ২৩১ মাইল উত্তর-পূর্বে সাগরের প্রায় ১৫.২ মাইল গভীরে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতার মাত্রা ছিল ৯। ১৯০০ সালের পর রেকর্ডকৃত ভূমিকম্পগুলোর মধ্যে এটি ছিল পৃথিবীর চতুর্থ সর্বোচ্চ এবং জাপানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে, সাগরে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস প্রায় ৩০ ফুট উঁচু ঢেউ নিয়ে তীরে আঘাত হানে। এই জলোচ্ছ্বাসের নামকরণ করা হয় সুনামি। ফেব্রুয়ারি ২০১৪-এর তথ্য মতে সুনামিতে ১৯,০০০-এর উপর মানুষ মারা যায়, ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রচুর স্থাপনা ও সম্পদের।

২০১১-এর এই সময় সেন্দাইয়ের ৪০ মাইল দক্ষিণে টোকিও ইলেকট্রিক কোম্পানির (টেপকো) অধীনে ফুকুশিমা দাইচি প্লান্টে ৬টি রিঅ্যাক্টর ছিল। এর মধ্যে তিনটি (ইউনিট ১, ২ ও ৩) অপারেশনে ছিল এবং অপর তিনটি (ইউনিট ৪, ৫ ও ৬) অপারেশনে ছিল না। ভূমিকম্পের ফলে প্লান্ট তিনটির বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। সুনামি ফুকুশিমা প্লান্টেও আঘাত হানে। ছবিতে (চিত্র ১) দেখা যায়, সাগর থেকে ১৪ মিটার উপরে পানির রেখা এবং রিঅ্যাক্টর বিল্ডিং, সেকেন্ডারি কন্টেইনমেন্ট প্রভৃতি ১০ মিটার পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনার পর জাপান সরকার সেন্দাইয়ের নিকটবর্তী এলাকায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ফুকুশিমা দাইচি প্লান্টকে কেন্দ্র করে ২০ কিলোমিটার এলাকা জনশূন্য করতে বলে। ফুকুশিমা দাইচি এবং ফুকুশিমা দাইনি মিলে ১ লাখ ৮৫ হাজার মানুষকে এসময় এলাকা ছাড়তে হয়। জলোচ্ছ্বাসের ফলে নিউক্লিয়ার প্লান্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৮৬ সালে চেরোনবিলে সংঘটিত নিউক্লিয়ার প্লান্টের দুর্ঘটনার মাত্রা ছিল সর্বোচ্চ (লেভেল ৭) এবং ১৯৭৯ সালে পেনসিলভানিয়ার থ্রি-মাইল আইল্যান্ডে সংঘটিত নিউক্লিয়ার প্লান্টের দুর্ঘটনার মাত্রা ছিল লেভেল ৫। ফুকুশিমা দাইচির ঘটনা এতই মারাত্মক ছিল যে, একেও লেভেল ৭ মাত্রার দুর্ঘটনা বলে ঘোষণা করা হয়। দুর্ঘটনার ফলে সাগরের পানিতেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে। জাপানের নিউক্লিয়ার রেগুলেশন অথরিটি (NRA) ফুকুশিমা নিউক্লিয়ার প্লান্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পানিতে টক্সিকের মাত্রা ৩ (জরুরি অবস্থা) বলে ঘোষণা করে। সিজিয়াম ১৩৪, সিজিয়াম ১৩৭, আয়োডিন ১৩১ প্রভৃতি পদার্থ বাতাস, পানির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে ৩০ জুন ২০১১ আবারও জাপান সরকার ফুকুশিমার উত্তর-পশ্চিমে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার এলাকা জনশূন্য করতে বলে। আমাদের দেশে রূপপুরকে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই রূপপুরেই বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ১০০০ মেগাওয়াটের দুটি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যার একটি স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। ফলে ভূমিকম্পসৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস কিভাবে ফুকুশিমায় নিউক্লিয়ার প্লান্টকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল বা কেন তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ল, সেটা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে সাধারণ ধারণা পেতে নিউক্লিয়ার প্লান্টের বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা জানা যেতে পারে।

Simplified cross-section through one of the reactors at Fukushima Daiichi showing the approximate location of critical components damaged by the tsunami. Not drawn to scale.

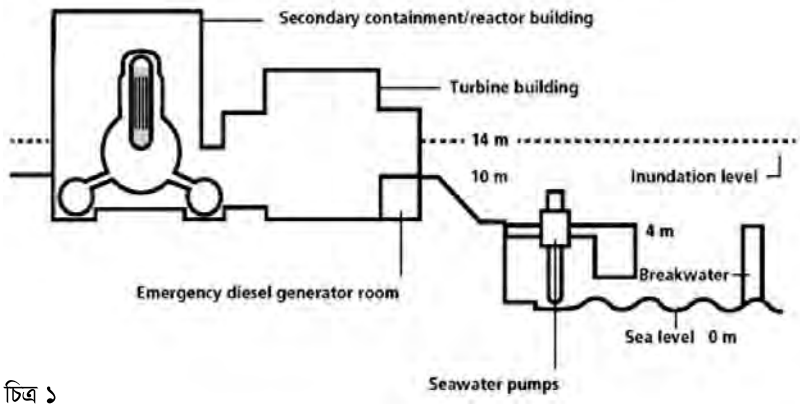

চিত্র ১

নিউক্লিয়ার প্লান্টে সাধারণত দুটি ভাগ থাকে। একটা অংশকে বলা হয় প্রাইমারি কন্টেইনমেন্ট, যার মধ্যে নিউক্লিয়ার রড, কন্ট্রোল রড এবং কিছু পাইপ নিয়ে রিঅ্যাক্টর কোর থাকে। রিঅ্যাক্টর সাধারণত দুই প্রকার। বয়েলিং ওয়াটার রিঅ্যাক্টর এবং প্রেশারাইজড ওয়াটার রিঅ্যাক্টর। প্রেশারাইজড রিঅ্যাক্টরে প্রেশারাইজার থাকে। প্লান্টের অপর অংশ সেকেন্ডারি কন্টেইনমেন্ট। প্রাইমারি কন্টেইনমেন্টের রিঅ্যাক্টর কোরে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে পানিকে উত্তপ্ত করা হয়। প্রেশারাইজড রিঅ্যাক্টরে উচ্চ তাপযুক্ত পানিকে উচ্চচাপে তরল করা হয়। প্রেশারাইজড রিঅ্যাক্টরের উত্তপ্ত পানি স্টিম জেনারেটরের সাহায্যে স্টিম বা বাষ্প তৈরি করে। অন্যদিকে বয়েলিং ওয়াটার রিঅ্যাক্টরে

কোরের তাপের মাধ্যমেই সরাসরি বাষ্প পাওয়া যায়। প্রাপ্ত বাষ্পকে সেকেন্ডারি কন্টেইনমেন্টের পাইপিংয়ের মাধ্যমে টারবাইনে পাঠানো হয়। এরপর অপরাপর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মতোই টারবাইনকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া যেহেতু একটা ক্রমাগত পদ্ধতি, সেজন্য এখানে বিভিন্ন রকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখতে হয়। যেমন– নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য কন্ট্রোল রড ব্যবহার করা হয়। আবার উচ্চ তাপ ও চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিরাপত্তামূলক কিছু পদ্ধতি থাকে। নিউক্লিয়ার রড সম্পূর্ণরূপে কন্ট্রোল রডে ঢুকিয়ে দিলেও প্রাইমারি কন্টেইনমেন্টে রেসিড্যুয়াল তাপ থাকে। এই তাপকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সার্বক্ষণিক পানির প্রবাহ প্রয়োজন। আবার চলমান একটা রিঅ্যাক্টরে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রাখা হলেও পরবর্তীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করতে ঝামেলা এড়াতে পানির প্রবাহকে কিছু মাত্রায় সব সময় গরম রাখতে হয়। সে কারণে পাম্পের মাধ্যমে প্লান্টে পানি সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হলে পাম্প চালানোর জন্য সব সময় প্লান্টে বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকতে হয়। কোনো কারণে বিদ্যুৎ না থাকলে, বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হয়। আবার উচ্চচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য পানির প্রবাহের মাধ্যমে তাপ নিয়ন্ত্রণ করে বা উচ্চ চাপযুক্ত গ্যাস, বাষ্প প্রেশার রিলিজ ভালভ দিয়ে নির্গমন করা হয়। এছাড়াও শক্তিশালী দ্বিস্তর বা জোড়াবিহীন কন্টেইনমেন্টের শিল্ড ব্যবহার করা হয়। মোটা দাগে, এসব নিরাপত্তাব্যবস্থা ছাড়াও ভূমিকম্প, বন্যা, প্রচণ্ড বেগের বাতাস অথবা বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিরাপত্তার দিক নিশ্চিত করে একটা প্লান্ট স্থাপন করতে হয়।

এই প্রযুক্তির অন্যতম কিছু বৈশিষ্ট্য নিউক্লিয়ার প্লান্টের নিরাপত্তা প্রশ্নকে বিভিন্নভাবে বড় করে তোলে। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া একটা অতি শক্তিশালী তাপ উৎপাদন পদ্ধতি, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রে পানি একটা বদ্ধ লুপে প্রবাহিত হয়, বিভিন্ন তাপ-চাপ-গতি-প্রবাহের দিকের উপর নির্ভর করে পানি বিভিন্ন রকম জটিল রূপ ধারণ করে। একেক অবস্থায় পানির তাপ পরিবহন ক্ষমতা, চাপ পরিবর্তন ক্ষমতা একেক রকম থাকে। সেই সাথে পুরো সিস্টেমটি বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মাপ, তাপ-গতিবিদ্যার নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন প্যারামিটার, অপারেশনাল কন্ডিশন-আপৎকালীন কন্ডিশন সব ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীল থাকে। তাই কোনো একটা প্যারামিটারের কিছু মাত্রার পরিবর্তন বা হেরফের হলে তা পুরো সিস্টেমকে প্রভাবিত করে। এই কারণে পুরো সিস্টেমকে, অন্ততপক্ষে সিস্টেমকে বেশি প্রভাবিতকারী প্যারামিটারগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে নিউক্লিয়ার প্লান্ট ডিজাইন করতে হয়। এ কারণেই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রকে অতি সূক্ষ্ম এবং উচ্চমানের প্রযুক্তি বলা হয়।

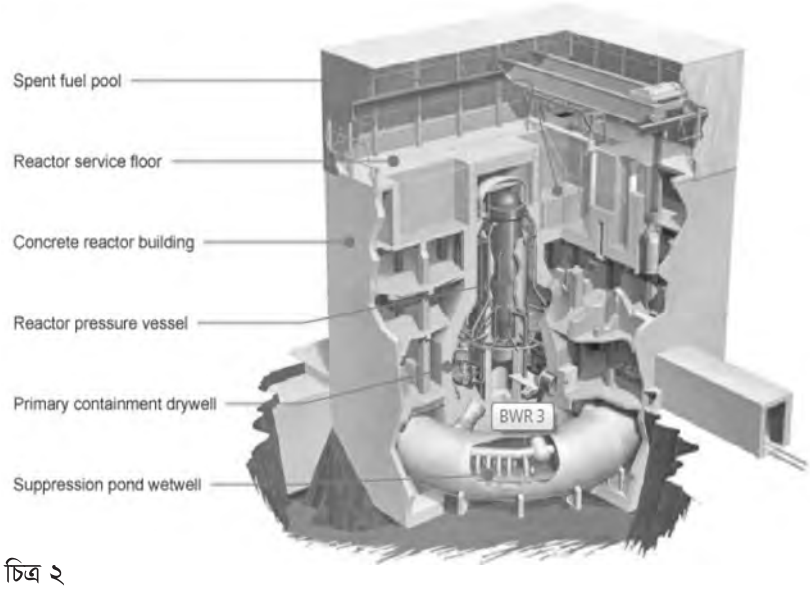

চিত্র ২

ফুকুশিমা দাইচির রিঅ্যাক্টরগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। এগুলো বয়েলিং ওয়াটার রিঅ্যাক্টর। ইউনিট-১ হতে ৪৬০ মেগাওয়াট, ইউনিট-২ থেকে ইউনিট-৫ হতে ৭৮৪ মেগাওয়াট এবং ইউনিট-৬ হতে ১১০০ মেগাওয়াট। ছবি (চিত্র ২) থেকে ফুকুশিমার প্লান্টের রিঅ্যাক্টর কোর অংশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। দেখা যাচ্ছে, রিঅ্যাক্টর ভেসেলকে প্রাইমারি কন্টেইনমেন্টের মাঝে রাখা হয়েছে।

ফুকুশিমায় ভূমিকম্প সংঘটিত হবার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রথম তিনটি প্লান্টের নিউক্লিয়ার রড, কন্ট্রোল রডের মাধ্যমে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে রিঅ্যাক্টর বন্ধ হবার পরেও মোট তাপ উৎপাদন ক্ষমতার ১.৫% এর মতো তাপ উৎপাদিত হচ্ছিল। অর্থাৎ ইউনিট-১-এ ২২ মেগাওয়াট, ইউনিট-২, ইউনিট-৩-এ ৩৩ মেগাওয়াটের মতো। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হওয়া মানেই নিউক্লিয়ার রডের কোর বিস্ফোরণ বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনামুক্ত হয় না। সেজন্য 'পোস্ট সেফটি মেজার' নিতে হয়।

পোস্ট সেফটি মেজার কী? পোস্ট সেফটি মেজার হলো, বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় কোর বা প্রাইমারি কন্টেইনমেন্টে যে উচ্চ তাপ ও চাপ থাকে, তা নিয়ন্ত্রণ করা। ফুকুশিমায় এই রেসিড্যুয়াল হিট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ ভূমিকম্পের প্রায় ৪১ মিনিট পর সুনামি ফুকুশিমায় আঘাত হানে। এর ৮ মিনিট পর জলোচ্ছ্বাসের দ্বিতীয় ঢেউ আঘাত হানে। ফলে প্রধান এবং সহযোগী কুলিং সিস্টেম, এর পাম্পগুলো পানির নিচে তলিয়ে যায় এবং বিকল হয় (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)। ব্যাকআপ হিসেবে ডিজেল জেনারেটর ছিল। কিন্তু ডিজেল জেনারেটরের বেশিক্ষণ ব্যাকআপ দেয়ার ক্ষমতা ছিল না। আবার যেহেতু এই

জেনারেটরগুলো টারবাইন বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টে ছিল, ফলে সেগুলোও তলিয়ে যায়। এতে করে সকল ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম বিকল হয়ে পড়ে। একে স্টেশন ব্ল্যাক আউট বা (SBO) বলে। এর ফলে চলমান তিনটি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের কোর কুলিং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কোরের তাপ ও চাপ দ্রুত বাড়তে থাকে।

এদিকে কোরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় পানি ফুটতে থাকে এবং বাষ্প হতে থাকে। উচ্চতাপে রিঅ্যাক্টর রডের ক্ল্যাডিং/আবরণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত ক্ল্যাডিং এবং বাষ্প মিলে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করতে থাকে। এর ফলে কোরের মাঝে চাপ আরো বেড়ে যায়। এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, হাইড্রোজেনের উচ্চচাপকে প্রেশার রিলিজ ভালভের মাধ্যমে ভেন্ট আউট করা হবে। কিন্তু চাপ এত বেশি ছিল যে, ভেন্টের ফলে হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হয়ে বিস্ফোরিত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেকেন্ডারি কন্টেইনমেন্ট। এই প্রেশার রিলিজ ভালভগুলো ছিল সেকেন্ডারি কন্টেইনমেন্টে। সেকেন্ডারি কন্টেইনমেন্ট মূলত পোস্ট সেফটি মেজারে ব্যবহৃত হয়। এখানে দুটি ডিজাইন এবং মেকানিক্যাল ত্রুটি আছে।

এক. প্রেশার রিলিজ ভালভ উন্মুক্ত স্থানে না রেখে সেকেন্ডারি কন্টেইনমেন্টে রাখা।

দুই. প্রেশার রিলিজ ভালভ কোরের ভেতরের চাপ সহ্য করে ধীরে ধীরে খুলতে পারার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন না হওয়া।

নতুন করে পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম চালু করা সময়সাপেক্ষ এবং ভেন্ট দিয়ে র‍্যাডিয়েশন নির্গত হতে থাকায় সমুদ্রের পানি দিয়ে কোর ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করা হয়। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হওয়ায় কোর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বন্ধ হয়নি। উল্টো সমুদ্রের পানিতেও উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। ইউনিট-১, ২, ৩-এর বিস্ফোরণ ইউনিট-৪-কেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ডিজাইন এবং মেকানিক্যাল ত্রুটি নিয়েই এ ইউনিটগুলো অনেক দিন বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে এবং শুধুমাত্র উপযুক্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েই এ ত্রুটিগুলো ধরা পড়েছে, এর আগে নয়। একে কি দুর্ঘটনা বলা হবে? কিন্তু উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তা নির্গত হওয়ায় পরিবেশ এবং জনগোষ্ঠী হুমকির মধ্যে পড়ে যায়। আর সাথে সাথে ফুকুশিমার এই ঘটনা, চেরনোবিল, থ্রি-মাইল আইল্যান্ডের ঘটনার পাশে স্থান নেয়।

ফুকুশিমায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কে নতুন করে ভাবা শুরু হয়। ইউরোপের অনেক দেশ, ইউরোপের বাইরেও অনেক দেশ নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র নতুন করে না বানানো, নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের উপর নির্ভরতা কমানো প্রভৃতি সিদ্ধান্ত নেয়। IAEA নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা বাড়ানোর উপর জোর দেয়। জেনারেশন-৩ বা জেনারেশন-৩+ এর নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন দেশ গবেষণা শুরু করে। পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, স্টেশন ব্ল্যাক আউটের সময় বিদ্যুৎচালিত পাম্প ব্যবহার না করে পানির উচ্চতা কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক সঞ্চালনের মাধ্যমে পানির প্রবাহ অব্যাহত রেখে রেসিডুয়াল তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। আধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে অন্যতম এই প্রযুক্তিকে প্যাসিভ সেফটি সিস্টেম (PSS) বলা হচ্ছে। কিন্তু প্যাসিভ সেফটি সিস্টেমের খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিক বিষয়ে এখনো কোনো স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করে প্লান্ট নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।

যা হোক, ফুকুশিমার ভয়াবহ বিস্ফোরণ বিশ্বব্যাপী নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীলতা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। এর ফলে বিভিন্ন দেশ কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়, তার ধারণা পাওয়া যাবে ২০১৩ সালে প্রকাশিত উপরের ছক থেকে।

দেশের নাম	*নীতিমালাকেন্দ্রিক অবস্থান/পরিবর্তন*
বেলজিয়াম, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড	নতুন করে আর কোনো পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন নয়, বরং যেগুলো আছে তা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
জাপান	নির্মাণাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, ফুকুশিমা কেন্দ্রের ১-৪ নম্বর ইউনিট আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে। ২০১২ সালের ৫ মের মধ্যেই অবশিষ্ট ৫০টি প্লান্ট বন্ধ করে দেয়া হয়। একই বছরের জুলাই মাসে দুটি প্লান্ট পুনরায় চালু করা হয়। পরমাণু প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এরই সাথে ২০৩০ সালের মধ্যে ধীরে ধীরে এই প্রযুক্তির ব্যবহার বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়।
চীন	নির্মাণাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর লাইসেন্স বাতিল করা হয়, কিন্তু ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে সেগুলোর কাজ পুনরায় শুরু করা হয়।
বেলারুশ, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত	প্রথমবারের মতো পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দেয়া হয়।
চিলি, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মরক্কো, থাইল্যান্ড, সৌদি আরব	পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে জোর চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে, কিন্তু এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।
বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, মিসর, জর্দান, নাইজেরিয়া, পোল্যান্ড	অবকাঠামো তৈরির প্রস্তুতি চলছে।
ইতালি, কুয়েত, সেনেগাল, ভেনিজুয়েলা	পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে।

ছক : ফুকুশিমা দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন দেশের নীতিমালাকেন্দ্রিক অবস্থান[১]

ছকে দেখা যাচ্ছে, নিউক্লিয়ার প্লান্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ অনেক দেশ নিউক্লিয়ারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিলেও মিসর, নাইজেরিয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকারও আমাদের জনবহুল এই দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করছে। এই ছকে নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের উপর অতিমাত্রায়

নির্ভরশীল ফ্রান্সের কোনো তথ্য নেই। ফ্রান্স এ বছরের বাজেটে নিউক্লিয়ারের উপর থেকে ভর্তুকি কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বাড়িয়েছে। এর যুক্তিসংগত কারণও রয়েছে।

EWEA-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সাল নাগাদ নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের খরচ দাঁড়াবে প্রতি মেগাওয়াট-ঘণ্টায় (১০০০ ইউনিট) ১০২ পাউন্ড। এই হিসাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে দীর্ঘসূত্রিতার ব্যাপারটাকে আমলে নেয়া হয়েছে, কেননা এটা কার্যতই নির্মাণ ব্যয়ের প্রাককালীন ব্যয়কে বহুগুণে ছাড়িয়ে যায়। অন্যদিকে একই সময়ে অর্থাৎ ২০২০ সালে বায়ুবিদ্যুতের খরচ দাঁড়াবে প্রতি ১০০০ ইউনিটে onshore ও offshore-এ যথাক্রমে ৫৮ পাউন্ড ও ৭৫ পাউন্ড।[২]

বিশ্বব্যাপী নিউক্লিয়ারনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরুদ্ধে জনমত যখন বাড়ছে, তখন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা, যেমন–UN নিয়ন্ত্রিত WHO নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের পক্ষে অবস্থান নিতে দেখা যাচ্ছে। তাদের নিউক্লিয়ারের পক্ষে জোর প্রচারণামূলক তৎপরতাও চোখে পড়ে। এতে করে প্রায়ই এই সংস্থাগুলোর সাথে পারমাণবিক প্রযুক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন দেশের সংগঠনের মতপার্থক্যও হয়। ২০১০-এ প্রকাশিত গার্ডিয়ান পত্রিকায় এ বিষয়ে রিপোর্টের অংশবিশেষে উল্লেখ করা হয়েছিল, "জাতিসংঘের অধীনস্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার দাবি অনুযায়ী, চেরোনবিল দুর্ঘটনায় সরাসরি আক্রান্ত হয়ে মারা যায় মাত্র ৫৬ জন (!) এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত দূষণে সেটি বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৪০০০ জনে। তারা এটাও দাবি করে যে এই দুর্ঘটনায় নাকি মাত্র কয়েকটি শিশুর ক্যান্সারজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছিল। আর বাদবাকি যেসব মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি, সেগুলোর পেছনে নাকি রয়েছে মানসিক চাপ, তেজস্ক্রিয়তা-ভীতি, দারিদ্র্য এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন (!)।

"কিন্তু রাশিয়া, বেলারুশ ও ইউক্রেনে তেজস্ক্রিয়তা দূষণে আক্রান্ত এলাকাগুলোতে কাজ করা বিজ্ঞানীরা এর সাথে কখনই সহমত পোষণ করেননি। আন্তর্জাতিক ক্যান্সার গবেষণা সংস্থা এবং জাতিসংঘেরই অধীনস্থ অন্য আরেকটি সংস্থার তথ্যানুযায়ী, চেরোনবিল দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা হবে ১৬,০০০ এবং রাশিয়ার বিজ্ঞান একাডেমির দাবি অনুযায়ী এই দুর্ঘটনায় কেবল রাশিয়াতেই মারা গেছে ৬০,০০০ এবং ইউক্রেন ও বেলারুশে মারা গেছে ১,৪০,০০০ জন। আবার বেলারুশের জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমির তথ্যানুযায়ী

EWEA-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সাল নাগাদ নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের খরচ দাঁড়াবে প্রতি মেগাওয়াট-ঘণ্টায় (১০০০ ইউনিট) ১০২ পাউন্ড। এই হিসাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে দীর্ঘসূত্রীতার ব্যাপারটাকে আমলে নেয়া হয়েছে, কেননা এটা কার্যতই নির্মাণ ব্যয়ের প্রাককালীন ব্যয়কে বহুগুণে ছাড়িয়ে যায়। অন্যদিকে একই সময়ে অর্থাৎ ২০২০ সালে বায়ুবিদ্যুতের খরচ দাঁড়াবে প্রতি ১০০০ ইউনিটে onshore ও offshore-এ যথাক্রমে ৫৮ পাউন্ড ও ৭৫ পাউন্ড।

মৃতের সংখ্যা আনুমানিক ৯৩,০০০ এবং মারাত্মক তেজস্ক্রিয় বিকিরণে ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা ২,৭০,০০০। ইউক্রেনিয়ান 'তেজস্ক্রিয়তা প্রতিরোধক কমিশন' (Radiation Protection Comission)-এর তথ্য বলছে, চেরোনবিল দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৫,০০,০০০ (!)।"[৩]

এমনকি পেনসিলভানিয়ায় ব্যাপক আকারে থাইরয়েড ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রকমের ক্যান্সার অতিমাত্রায় দেখা যাওয়ায় থ্রি-মাইল আইল্যান্ডের দুর্ঘটনাকে অনেকে দায়ী করলেও মার্কিন সরকার সেটা অস্বীকার করে আসছে। পারমাণবিক প্রযুক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কতখানি নিরাপদ, ঝুঁকিহীন তা বারবারই প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে।

দেবাশীষ সরকার: প্রকৌশলী ও গবেষক
ইমেইল: debu99me@yahoo.com

তথ্যসূত্র :

১.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X12000454

২.
http://www.ewea.org/blog/2012/02/french-nuclear-set-to-become-more-expensive-than-wind-power/

৩.
http://www.theguardian.com/environment/2010/jan/10/chernobyl-nuclear-deaths-cancers-dispute